ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সুরেলা কণ্ঠের ঝর্ণা ধারা সৃষ্টির যাদুকর আদ্যন্ত বাঙালি উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দের সিমলা পাড়ায় এক মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়িতে ১৯১৯ সালের বিখ্যাত ১লা মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন মান্না দে। ছাদে ঘুঁড়ি ওড়ানো , কুস্তি করা, আড্ডা দেওয়া, ফুটবল খেলার নেশার সঙ্গে প্রত্যহ গানের রেওয়াজ করতেন তিনি কাকা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে পদ্মশ্রী, ২০০৫ সালে পদ্মভূষণ, ২০০৭ সালে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৫৩ সালে কেরল কন্যা সুলোচনাকে বিয়ে করেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে ভাষার দ্যোতনা, উচ্চারণ শৈলী, এক্সপ্রেশন এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ মানুষের মনে এমন ভাবে দাগ কেটে দিত যেটা চিরদিন মানুষ মনে মনে গেয়ে চলে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় স্বয়ং সরস্বতী যেন সুরলোক থেকে গেয়ে যেতেন। কিন্তু মান্না দে-কে কঠোর পরিশ্রম করে উঠতে হয়েছে ওখানে। বাড়ীতে ছিল সুরচর্চার পরম্পরা। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে সিনেমা, থিয়েটারের গানে একজন সুদক্ষ গায়ক। বাড়িতে গানের মানুষের আসা যাওয়া আর কানে শুনে যাচ্ছেন - দিলীপ রায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গান। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র , শচীন দেব বর্মন, পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় আর হেমন্তের কণ্ঠে গান শুনতে শুনতে তাঁর পথ চলা, যা তাঁর মনের বীণায় তার বেঁধে দিত। মার্গ ও লঘু সংগীতের তালিম চলছে কাকা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। ঠিক তখনই গাইবার ডাক আসছে অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। তিনি নিজেও ভাবেননি, একজন সংগীত শিল্পী হবেন। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র হয়তো চিন্তা করেছিলেন, এরকম পরিস্থিতিতে গানে উন্নতি করতে গেলে, সিনেমায় প্লে ব্যাক করে উন্নতি করতে হবে। তাই তাকে যেতে হবে মুম্বাই (বোম্বে)। কারণ ভারতে সিনেমার জন্ম কলকাতায় হলেও, সেই আভিজাত্য কলকাতা ধরে রাখতে পারেনি বেশিদিন। পৃথ্বীরাজ কাপুরের হাত ধরে মুম্বাই চলে গেছে এই শিল্প। আর সেখানকার ব্যবসাদাররা সিনেমায়

টাকা ঢেলে হিন্দি সিনেমাকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে মানুষের মনোগ্রাহী এক পণ্য হিসেবে বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে বাংলা সিনেমা টাকার অভাবে উন্নতি করতে পারছে না। কাকা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরে মান্না দে মুম্বাই আসেন। ১৯৪২ সালে। কাকার হাত ধরে সিনেমার পটভূমিকা অনুযায়ী তাতে গানের যথাযথ প্রয়োগ ভাল ভাবে বুঝতে লাগলেন এবং তাঁর সহকারী হিসাবে সংগীত পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কাকা ছাড়াও - শচীন দেববর্মণ, অনিল বিশ্বাস এবং ক্ষেমচাঁদ প্রকাশেরও সহকারিত্ব করেছেন তিনি। বাংলা ছাড়াও হিন্দি, গুজরাতী, মারাঠী, মালায়ালম, তামিল প্রভৃতি ভাষায় তাঁর কণ্ঠ ছিল স্বচ্ছল, যাদুময়। কঠোর অনুশীলনের পর, মান্না দে-র কাকার সঙ্গে প্রথম ডুয়েট ও পরে একক আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৪৩ -এ 'তামান্না' ছবিতে প্রথম প্লে ব্যাক কাকার সঙ্গে এবং পরে মেহবুবের লিপে 'পড়োশানে'। তাঁর গানে লিপ দিয়েছেন - বলরাজ শাহানী, প্রাণ, মেহবুব, রাজেশ খান্না আর প্রেম ভালোবাসাসহ জীবনের নানা মুহূর্তের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় উত্তম কুমারের লিপে এবং সেই গান, সেই সুর, সেই গলা, মানুষের অন্তরে আঁচড় কেটে জীবন্ত হয়ে এখনও বেঁচে আছে। তাঁর রাগাশ্রয়ী গানের পাশে, প্রেমের গান, আর কাওয়ালিও ফুলের মতো সৌন্দর্য্য বিভায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'মেরা নাম জোকার', 'আনন্দ' কিংবা 'শোলে'-তে তাঁর গান এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত ও মান্না দে একত্রে যে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়েছিলেন গানের বাগানে তা আজও চির ভাস্বর হয়ে আছে। 'বাজে গো বীণা', কিংবা ডাকহরকরা ছবিতে 'লাল পাগড়ি দিয়ে মাথে'-এই সব গান অন্য মাত্রা পেয়েছে। তাঁর আরও সব হিট গান - 'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও', 'বড় একা লাগে এই আঁধারে', 'আমি আকাশের মতো একেলা', 'কোথায় পথের প্রান্তর', 'আমার বলার কিছু ছিলনা', 'বাঙ্গালীর সব খেলার সেরা ফুটবল', 'কে তুমি নন্দিনী', 'কে প্রথম কাছে এসেছি', 'আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না', 'বড় আদরের ছোট বোন', 'তীর ভাঙ্গা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়' 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে।'

কলকাতায় একটা মিউজিক একাডেমি করার স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু তা পূরণ হয়নি, কিন্তু এক দিনই মাত্র একটাই দিন তাঁকে পেয়েছিল তাঁর প্রিয় কলকাতা - তাঁকে গানের শিক্ষক হিসাবে। ২০০০ সালের ৩০ শে নভেম্বর অনুশীলা বসুর উদ্যোগে কলাভূৎ -এ তাঁর সংগীত শিক্ষার আসর বসেছিল। কে নেই সেখানে? সেখানে উপস্থিত ইন্দ্রাণী সেন, মনোময় ভট্টাচার্য, শম্পা কুণ্ডু, শুভঙ্কর ভাস্কর, জয়তী চক্রবর্তী, অমৃতা দত্ত, দেবমাল্য, দেবযানী ভট্টাচার্য, সুপর্ণকান্তি ঘোষ প্রমুখ।

১৯১১ সালের ১লা মে যাঁর জন্ম, সেই কিংবদন্তী শিল্পী মান্না দে, পাঁচ মাসেরও বেশী মরণের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ২০১৩ সালের ২৪শে অক্টোবর ভোর ৩টা ৫০ মিনিটে ৯৪ বৎসর বয়সে বাঁচার যুদ্ধে ইতি ঘোষণা করে চলে গেলেন। যদিও তিনি হিন্দি গান গেয়ে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেয়েছেন, তবুও তাঁর নাড়ীর টান ছিল বাংলার মাটিতে কলকাতার গর্ভগৃহে। সেই জন্যই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলার হৃদয়ের মানুষ। মান্না দে নিজের প্রচেষ্টার জোরে একজন শিল্পী মহীরুহ হয়ে উঠে ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পীদের একজন হয়ে ওঠেন, 'তাঁর তিন ভুবনের পারে' ছায়াছবিতে 'জীবনে কী পাবনা' - এই গানতো আজকেরই কথা। এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সেখানেই যেখানে তাঁর গান ভিন্নধর্মী বিভিন্ন গানের ও বিভিন্ন রসের যেন এক মনোমুগ্ধকর রামধনু রঙ্গীন বিভায় বিকশিত। এহেন এক মহৎ শিল্পীর মহাপ্রয়াণ যেন এক গভীর নিঃস্তব্ধতার মধ্যে গেয়ে যেতে লাগলো তারই কণ্ঠে যেন - 'বড় একা লাগে এই আঁধারে।' এক প্রত্যক্ষ দর্শীর ভাষায় - 'সেই পরিচিত চোহারা খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথায় টুপি? কোথায় চশমা? দক্ষিণী ধরনে সাজানো এক চতুর্দোলা। না গদি, না তোষক, শুধু খড় বিছানো তিন চাকার টেম্পোর উপর শোয়ান হলো নিষ্প্রাণ শিল্পী মহীরুহকে।' মনে হচ্ছে কে যেন হঠাৎ তার কণ্ঠে নেপথ্যে গেয়ে উঠলো - 'মুকুটটাতো পড়ে আছে, আমি রাজা নই'। চতুর্দোলা শোভিত সেই টেম্পো চললো সুলোচনার অন্তিম শয়নের পাশে, সেই কাবেরী নদীর তীরে হেব্বাল শ্মশানে। তাঁর গলায় যেন ভেসে আসছে তাঁর পিতৃব্যের গাওয়া গান - 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে.....'